

## একটি পড়ন্ত বিকাল

Atik Ullah

December 18, 2021

9 MIN READ

গরু-মুরগ মুসল্লম-খাসি কিছুই বাদ পড়লো না। ফল-পাকুড়ও কেনা হলো এন্তার!! ছ'হাত ভর্তি করে ফাঁপরে পড়া গেল, এবার কোথায় যাই? যাওয়ার জায়গার তো অভাব নেই! কিন্তু প্রাইভেসি? ঠিক হলো পার্কেবসা হবে। খোলা নীল আকাশের নিচে। দিঘীর পাড়ে। বিশাল সরোবর। স্বচ্ছতোয়া টলটলে পানি! আমরা বসলাম উত্তর পাড়ে। দক্ষিণে বিপুল জলরাশি! দখিনা বাতাস ক্লান্তিহীন বয়ে বেড়াচ্ছে। সারাদিনের রোজার ক্লান্তি নিমিষেই উবে হাওয়া! কর্পূর!

কিন্তু সত্যিকারে রোযা শুরু হলো তখন। শরীর জুড়িয়ে গেল দখিনা সমিরনে। কিন্তু সামনে এতসব মজার পেটরোচক থাকলে জিবে জল-পানি-ওয়াটার-মা- নামবে নাতো কী?। কোথায় দিঘীর জলে কার ছায়া গো-এর শোভা দেখবো, তা না, চোখ শুধু ঘুরেফিরে খাবারের দিকেই বলে যাচ্ছে।

অনেক খুঁজে পেতে যুতসই একটা আসন পাওয়া গেল। ঠিক মাঝ বরাবর। পুরো দিঘীটা এক নজরে দেখা যায়। আশেপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকেও চোখ রাখা সহজ। রোযার দিন হওয়াতে তেমন মানুষজন নেই। ফাঁকা। খাঁ-খাঁ। একদম যে নেই, তাও নয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু কপোত-কপোতীর আনাগোনা বিরল নয়।

এতক্ষণ চলছিল সবকিছু ঠিকঠাক! অদূরেই বসা ছিল একযুগল। খাঁটি হুয়ুর-হুয়ুরনী! আমরা পার্কেপ্রবেশের পর থেকেই দেখলাম দু'জনের মধ্যে চাপা একটা অস্বস্তি কাজ করছিল। হুয়ুর বারবার আড়চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা প্রথমে চোখে পড়েনি। সাইফুলের জুহুরি-চোখেই ব্যাপারটা ধরা পড়লো। একটু পরে আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে, তারা দু'জন অন্যদিকে চলে গেল। অন্য পাশে গিয়ে বসলো। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু ঠেকলো। সন্দেহজনক।

তারা তো আমাদের অবস্থান থেকে বেশ দূরেই ছিল। একটা গাছের আড়ালে। তাদের কথাবার্তা আমাদের শোনার কথা নয়। এমনকি সরাসরি দেখাও যাচ্ছিল না। যাক আমরা গাল-গল্পে ডুবে গেলাম। বিষয়টা নিয়ে ভাবার সময় পেলাম না।

ইফতারির তখনো অনেক সময় বাকি। আমরা তিনজনে সাইফুলের আই-ফোনের বিভিন্ন তেলসমাতি দেখা নিয়ে ব্যস্ত। সেই তরুন হুয়ুর এলেন। আমাদের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। কাঁচুমাঁচু ভঙ্গিতে বললেন:

-ভাই! একটু হাম্মামের প্রয়োজন ছিল। কোথায় পাওয়া যায়? পার্কেরটা তো বন্ধ। তালা দেয়া।

তিনজন একযোগে চোখ তুলে তাকালাম। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, খুবই গরীব ঘরের মানুষ। শাদা জুঝা-পায়জামা। কাঁধে খাঁটি হুয়ুরদের মতো রুমাল ঝোলানো। চাপ দাড়ি। গায়ের রঙ কালোর দিকে। চোখে দু'টোতে কেমন একটা অসহায়-নিরীহ দৃষ্টি। কথা বলার সময় ঠোঁটের কোনে কেমন একটা বিষন্ন হাসি লেপ্টে থাকে। দাঁতের পাটি খুবই বিন্যস্ত। অসম্ভব শাদা। মানুষটার স্করুণ হাসি দেখেই আমাদের তিনজনের মনটা কেমন হয়ে গেল।

সাইফুল মানুষটার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসলো। আসলে তাদের এমন বেমক্লা উঠে যাওয়াটা আমাদের মনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে:

-আপনারা আমাদের দেখে চলে গেলেন কেন?

-না না, ভাই অন্য কিছু মনে করবেন না। ও আমার স্ত্রী।

-বাথরুম কি আপনার জন্যে?

-জি না। ওর জন্যে।

সাইফুল সব কাজের কাযি। সে একদৌড়ে গিয়ে পার্কের অফিসে হস্তিত্ব করে বাথরুমের চাবি নিয়ে এল। হুয়ুর এক দৌড়ে

গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। আমাদের অবস্থান থেকে একটু দূরেই বাথরুম। অত্যন্ত পুরোনো জীর্ণ একটা বোরখা পরা। হাতমোজা-পা-মোজা পরা। জুতোগুলো ছেঁড়া। না চাইতেই বিষয়গুলো নজরে পড়ে গেল। স্বামীর জুতোগুলোও দেখলাম ছেঁড়া! পা ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে হাঁটছেন।

সাইফুল হুয়ুরকে ডেকে বললো:

-আমাদের সাথে ইফতারি করবেন?

-জি না, ভাই, লাগবে না। ও এনেছে।

কথা আর এগুলো না, স্ত্রী প্রয়োজন সেরে বের হলো। আমরা বলে দিলাম:

-যদি সম্ভব হয়, তাকে রেখে একটু আসবেন।

আমরা ভেবেছিলাম হুয়ুর আসবেন না। আমাদের অবাক করে দিয়ে একটু পরেই চলে এলেন:

-আপনারা এ সময় পার্কে কেন? বাসায় যাবেন না?

প্রশ্নটা শুনে হুয়ুর একটু থমকে গেলেন। চুপচাপ থেকে যা বললেন, তা শোনার জন্যে আমরা তিনজনের কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের মনের মধ্যে, স্নেহ-করুণা-ভালোবাসা-শ্রদ্ধার এক অবিমিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হলো। হুয়ুর বললেন:

-বাসা থাকলে তো যাবো!

-মানে?

-আমাদের দু'জনেরই আসলে কোনও বাড়িঘর নেই।

-বলছেন কী! এটা কী করে সম্ভব? খুলে বলুন তো!

হুয়ুর প্রশ্নটা শুনে একটু যেন বিমনা হয়ে গেলেন। চেহারায় সংকোচ ফুটে উঠলো। শরম-দ্বিধা-জড়তার মিশেলে অন্যরকম একটা অভিব্যক্তি।

-আচ্ছা, সমস্যা থাকলে বলার দরকার নেই। থাক।

-না না, বলছি। কথা তো অনেক লম্বা। দু-এক কথায় আসলে সব কথা বলা যাবে না।

-আপনি খুলেই বলুন। আমরা শুনবো।

-আমার বাবা ছিলেন গ্রামের মসজিদের মুয়াজ্জিন। খুবই গরীব। আত্মীয় স্বজন থেকেও নেই। জমিজমা বলতে ছোট্ট একটা ভিটে। সেটাও পৈতৃকসূত্রে পাওয়া নয়। আব্বা মসজিদে চাকুরি নিয়ে গ্রামে এলেন। অনেক দিনের চাকুরির সুবাদে, গ্রামের মানুষ ধরাধরি করে, সেখানেরই এক এতীম মেয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সবাই বিয়ে করে স্বামীর বাড়ি গিয়ে ওঠে। আব্বাজান মরহুম বিয়ে করে বউয়ের বাড়ি গিয়ে উঠলেন। আমার দাদাজান আব্বাকে কিছুই দিয়ে যেতে পারেন নি। এমনকি ভিটেটুকুও না।

আমার আত্মা থাকতেন তার মায়ের সাথে। খুবই কষ্টে। এ বাড়ি-ও বাড়ি ঝিয়ের কাজ করতেন আমার নানি। কিন্তু মেয়েকে এসবে জড়াতে দেননি। টাকা-পয়সার অভাবে লেখাপড়াও শেখাতে পারেন নি। কিন্তু আমার নানি খুব সুন্দর কুরআন শরীফ পড়তে পারতেন। সেটাই মেয়েকে শিক্ষা দিয়েছেন। যতও করে। আমার মায়ের শিক্ষা বলতে এটুকুই।

বিয়ের কিছুদিন পর আমার নানী মারা গেলেন। আব্বাজান মসজিদ থেকে যা পেতেন, ওটা দিয়েই কোনও রকমে সংসার চলছিল। আমার বয়েস তখন আট বছর। আত্মাজান ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কোনও চিকিৎসাতেই কিছু হচ্ছিল না। এদিকে টাকাপয়সার টানাটানি। আব্বাজান কারও কোনও বারণ না শুনেই আমাদের একমাত্র সম্বল বাড়ির ভিটেটা বন্ধক দিয়ে টাকা আনলেন। আত্মাজানকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করালেন। এক সপ্তাহ পর আত্মাজান জাহ্নাতবাসী হলেন।

আব্বাজান শোকে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। শুধু সময় মতো আযানটুকু দেন। এরই মধ্যে আমি পাশের গ্রামে নুরানি শেষ করে হেফযখানায় ভর্তি হয়েছি। আমার হেফয শেষ হওয়ার আগেই, বন্ধকের টাকা শোধ করতে না পারায়, আমার মায়ের শেষ স্মৃতি, বাড়ির ভিটেটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

আব্বাজান স্থায়ীভাবে আগের মতো মসজিদে আশ্রয় নিলেন। আমিও মাদরাসার ছুটিছাটায়, আব্বাজানের কাছে মসজিদেই উঠতাম। মসজিদই ছিল আমার বাড়ি-ঘর। মুসল্লিদের বাড়ি থেকে আব্বাজানের জন্যে যে খাবার আসতো, সেটাই বাপবেটা ভাগাভাগি করে খেতাম।

খাবারের কষ্টের কারণে, পরের দিকে আমি ছুটি হলেও মাদরাসাতই থেকে যেতাম। আব্বার কাছে বাড়তি টাকা থাকতো না। বাড়ি-বন্ধকের টাকা ছাড়া আরও কিছু ঋণ হয়ে গিয়েছিল, বেতনের টাকা পেয়েই কিছু কিছু শোধ করতেন।

মায়ের শোক আব্বাজান বেশিদিন সহিতে পারলেন না। আমার খতম হওয়ার বছর ইন্তেকাল করলেন। ছেলেকে হাফেয দেখার কী অসম্ভব আরযু ছিল। পূরণ হলো না। মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে যখন আমাকে পাগড়ি পরানো হচ্ছিল, আব্বাজানের আজন্ম ইচ্ছার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমাদের বড় ভ্রূর যখন পাগড়ী পরিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আব্বাজানের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললাম। উপস্থিত হাজার-হাজার মানুষের অনেকেই আমার কথা জানতো। তারাও অনেকে কেঁদে ফেললো। এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো। বড় ভ্রূর আমাকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। আব্বাজান মারা যাওয়ার পর তিনিই আমাকে আগলে রাখতেন।

হেফযখানা থেকে ফারেগ হলাম। সে-মাদরাসাতেই কাফিয়া জামাত পর্যন্ত পড়লাম। এরপর আর জামাত নেই। ভ্রূর পরামর্শ দিলেন, হাটহাজারি চলে যেতে। ভাড়া ও সাথে কিছু খরচাপাতি দিলেন।

ভাই! কাহিনী তো অনেক লম্বা। হাটহাজারি যাওয়ার পর টাকা ফুরিয়ে গেল। তখন এক ভাইয়ের পরামর্শে অন্যদের খাবার রান্না করে দেয়ার চাকুরি নিলাম। বিনিময়ে কিছু টাকা পওয়া যেত, খাবারটাও ফ্রি। রিকশা চালিয়েছি। ক্ষেতে কাজও করেছি। আমার ইচ্ছে ছিল দেওবন্দ যাবো। আব্বাজান কার কাছে যেন শুনেছিলেন দেওবন্দের কথা। তিনি কয়েকবার বলেছিলেন। তখন তো ছোট ছিলাম, বুঝতে পারিনি। হাটহাজারি এসে বুঝতে পেরেছিলাম। তাই টাকা জমাচ্ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেওবন্দ যাওয়া হলো না। দাওরা পাশ করলাম।

হাটহাজারীর দীর্ঘ ছাত্রজীবনে কোথাও যাইনি। যাওয়ার জায়গাও তো ছিল না। যাবো কোথায়? একবার খুব খারাপ লাগাতে, চুপিচুপি আমাদের ভিটেটা দেখে এসেছিলাম। আম্মাজান-আব্বাজানের কবর যেয়ারত করে এসেছিলাম।

আমার আগের মাদরাসার বড় ভ্রূরের সাথে একটু যোগাযোগ ছিল। তিনিই পরামর্শ দিলেন, গ্রামের মাদরাসায় গিয়ে শিক্ষকতা শুরু করতে। তার পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারলাম না। ছেলেবেলার মাদরাসায় এসে যোগ দিলাম। সুযোগ পেলেই পাশের গ্রামে চলে যেতাম। একজন গৃহহীন-ছন্নছাড়া মানুষ আমি। আম্মাজান-আব্বাজানের স্মৃতিটুকুই আমার সম্বল। আমার এত অসহায়ত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন। এর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। আমার মাওলানা হওয়াতো দূরের কথা, হাফেয হওয়ারও কথা ছিল না।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি ঠিক করলাম:

-আল্লাহ তা'আলা আমাকে অযোগ্যতা সত্ত্বেও এত নেয়ামত দিয়েছেন। এতদূর নিয়ে এসেছেন, এর শুকরিয়া আমি একটু অন্যভাবে আদায় করার চেষ্টা করবো।

-কিভাবে?

-আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি বিয়ে করবো এমন মেয়েকে, যে আমার চেয়েও অসহায়।

হাটহাজারি পড়াবস্থায় আমাদের ফেনির এক ছাত্রের সাথে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ফারেগ হওয়ার পরও তার সাথে যোগাযোগ হতো। মাদরাসার কাজে ফেনি এলে তার দোকানে যেতাম। তারা অনেক বড় লোক। অনেক বড় ব্যবসা।

আমি জানতাম তার এক বোন মাদরাসায় পড়ে। সময় বুঝে একদিন তার কাছে বিয়ের কথা বললাম। বন্ধু আমার কথা শুনে প্রথমে ভুল বুঝলো। সে মনে করেছিল, আমি তার বোনের ব্যাপারে আগ্রহী। তার ভুল ভাঙতে দেবী হলো না। আমি বললাম:

-ভাই! আপনার বোনের একটু সহযোগিতা লাগবে।

-কেমন?

-আমার এমন একটা পাত্রীর প্রয়োজন, যে মাদরাসায় পড়ে বা পড়ায়। কিন্তু বিয়ে আটকে আছে। গরীব। অসহায়। ইয়াতীম। ভিটেমাটি ছাড়া।

বন্ধুভীষণ অবাক হলেও, আমাকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিল। মাসখানে পরেই কাঙ্ক্ষিত সংবাদ মিলল। এর মধ্যে অবশ্য মাদরাসার আশপাশ থেকেও কিছু প্রস্তাব এসেছিল। সেগুলো গ্রহণ করলে, 'বউয়ের পাশাপাশি, আমার দুনিয়াবী অনেক হালাল চাহিদাও পূরণ হয়ে যেত। এমনকি আমার মা-বাবার ভিটেও পুনরায় কেনার অর্থিক সম্ভাবনা হয়ে যেতো। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম। আমার এটুকুদূর বিশ্বাস আছে, টাকা-পয়সার যোগানদাতা বান্দা নয়, আল্লাহ। আমাদের হাটহাজারির বাবা হুজুরের কাছে এ কথাটা বারবার শুনেছি।

বন্ধুর বোনের মারফতই পাত্রীর খবর পেলাম। শেষের দিকে কেন যেন, বন্ধুর মা এবং বোনও আমার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিমরাজি হয়ে গিয়েছিল। হাবভাবে বুঝতে পারতাম, বন্ধুও গররাজি ছিল না। আমি আমার 'শুকরিয়াজ্ঞাপন'-পদ্ধতি থেকে একচুলও নড়লাম না।

আমার স্ত্রী হাফেয়া। টাকাপয়সার অভাবে সেও পড়ালেখা করতে পারেনি। তারও ইহজনে কেউ নেই। বাড়িঘর নেই। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তার অবস্থা আমার চেয়ে হাজারগুণ খারাপ। আমি তো তা-ও-বা মায়ের আদর পেয়েছি। সে তাও পায়নি। তার পুরো ইতিহাস বলতে গেলে রাত ফুরিয়ে যাবে।

তার মাদরাসার বড় খালা, দয়া করে তাকে হেফয খানায় শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। খুবই অল্পবয়েসে। প্রথম প্রথম তো বেতন পেত না। এখন অবশ্য দেড় হাজার টাকা করে পায়। এ সামান্য বেতনেও সে কী যে খুশি! অথচ চব্বিশ ঘণ্টার খেদমত। আমরা দু'জনেই টাকা জমাচ্ছি। আমাদের আগের বাড়িটা কেনার ইচ্ছে। ইনশাআল্লাহ ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বাড়তি কোনও আয়োজন ছাড়াই, আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। কোথাও নিজস্ব ঘর না থাকাতে, বাসর হলো না। পরে বন্ধুটি দয়াপরবশ হয়ে, বিয়ের এক সপ্তাহ পর, তাদের বাড়িতে দু'দিন থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল।

এখন আমরা শুধু কথা বলি। মাঝেমধ্যে আমি গিয়ে তার মাদরাসায় দেখা করে আসি। আজই প্রথমবারের মতো তাকে নিয়ে বাইরে বের হয়েছি। এরপর মাদরাসার টাকা কালেকশনে চট্টগ্রামে চলে যাবো। ঈদের আগে তো দেখা হবে না।

আপনাদের দাওয়াত গ্রহণ করতে পারলাম না বলে, রাগ করবেন না। 'ও' তাদের মাদরাসার 'রান্নাখালা'-কে অনেক বলেকয়ে, কাকুতি-মিনতি করে, এক ঘণ্টার জন্যে গ্যাসের চুলোটা খালি পেয়েছে। সে নিজ হাতে আমার জন্যে কিছু একটা তৈরী করে এনেছে।

জানেন, সে খুবই ভাল রান্না করতে পারে। হাফেয়া হওয়ার পর, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই দেখে, সে তার মাদরাসায় কয়েক বছর 'রান্নাআপু'-এর চাকুরি করেছিল। তখনই সে মূলত অনেক রান্না করতে শিখে।

আযান হয়ে গেল। হুযুর তড়িঘড়ি চলে গেলেন। আমরা ফেনির বিখ্যাত জিলিপি হাতে বসে রইলাম। স্তব্ধ। নির্বাক। অশ্রুসজল। একজন ইয়াতীম গরীব মেয়ে যে বিয়ের সময় কতোটা অসহায় আর বিপন্ন বোধ করে, সেটা আমার ভালভাবে জানা আছে।